৯ জুলাই ধর্মঘটের প্রাক্কালে

৪ জুলাই ২ ঘণ্টা কর্মবিরতির ডাক যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে

২৪ জুন, মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যৌথ মঞ্চের আহ্বানে কলকাতায় কেন্দ্রীয় জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়। বিকেল ৪টা থেকে ৭টা পর্যন্ত কলকাতা কর্পোরেশন সংলগ্ন এলাকায় গণ অবস্থান ও বিক্ষোভে শামিল হন কর্মচারী এবং শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠন। শ্রমকোড বাতিল, অবিলম্বে বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, ষষ্ঠ পে-কমিশনের সুপারিশ জনসমক্ষে প্রকাশ, চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ, শূন্যপদে স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগ সহ বিভিন্ন দাবিতে ছিল এদিনের কেন্দ্রীয় অবস্থান বিক্ষোভ। একইসাথে আগামী ৯ জুলাই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটে শামিল হবার আহ্বান

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

জানানো হয় এদিনের বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে। আদালতের দেওয়া সময়সীমার মধ্যে বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান এবং ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রকাশ না করা হলে ৪ জুলাই দু'ঘণ্টা কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয় অবস্থান মঞ্চ থেকে।

যৌথ মঞ্চের তরফে প্রথমে রানী রাসমনি এভিনিউতে

বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য

জমায়েতের পরিকল্পনা নেওয়া হলেও প্রশাসনের অনুমতি না মেলায় অবস্থান বিক্ষোভের স্থান বদল করে কলকাতা কর্পোরেশন সংলগ্ন অঞ্চলে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিনের অবস্থান বিক্ষোভের সূচনা হয় দৃপ্ত স্লোগানের মধ্য দিয়ে। এরপর

২৪ জুন, ২০২৫ জমায়েতের একাংশ

গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক টীমের সদস্যরা। সভার শুরুতে নদীয়ার কালীগঞ্জে শাসকদলের সন্ত্রাসে নিহত নাবালিকা তামান্না খাতুনের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করা হয় যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে। শোকজ্ঞাপন করা হয় প্যালেস্টাইন, ইরান সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইজরায়েলের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে নিহতদের প্রতি। শোক জ্ঞাপন করা হয় পহেলগাঁও সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহত মানুষদের স্মৃতির প্রতি। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন যৌথ মঞ্চের নেতৃবৃন্দ।

এদিনের অবস্থান বিক্ষোভ সমাবেশের পরিচালনা করেন মানস দাস, সুদীপ্ত গুহ, সুব্রত মান্না, রতন ভট্টাচার্য, সমীর গিরি, বলাই

নদীয়া

বিক্ষোভসভার প্রারম্ভে যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে প্রস্তাব পেশ করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়। প্রস্তাবে শ্রমকোড বাতিল, আদালতের নির্দেশ মেনে বকেয়া ২৫ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদান, মূল্যসূচক মেনে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদান, স্বচ্ছতার সাথে শূন্যপদে নিয়োগ, চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের স্থায়ীকরণ সহ বিভিন্ন দাবির সমর্থনে প্রস্তাব পেশ করা হয়। প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় আগামী ৯ জুলাই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আইনজীবী তথা সাংসদ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, আইনজীবী ফিরদৌস শামিম, যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী সহ পঞ্চায়েত কর্মচারী সমিতি সমূহের যৌথ কমিটি, এবিটিএ, এবিপিটিএ, যুক্ত কমিটি, স্টিয়ারিং কমিটি, জয়েন্ট কাউন্সিল, জয়েন্ট ফোরাম অফ কলকাতা কর্পোরেশন, কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী যুক্ত সংগ্রাম পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ পলিটেকনিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি সহ যৌথ মঞ্চের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ।

এদিনের বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশিষ্ট

দেবব্রত রায়

আইনজীবী তথা সাংসদ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য এরাজ্যের শাসকদলের মদতে সরকারী স্তরে ঘটে চলা বিভিন্ন দুর্নীতির কথা তুলে ধরেন। কেন্দ্রের শাসকদল থেকে রাজ্যের শাসকদল কীভাবে ইলেক্টোরাল বন্ডের নামে বিভিন্ন কর্পোরেট হাউসের থেকে

ফিরদৌস শামিন

আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে, এবং এর ফলে কীভাবে জীবনদায়ী ওষুধের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে এবং পেনশনার থেকে সাধারণ মানুষ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তা তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন যে মুখ্যমন্ত্রীকে জবাব দিতে হবে যে শিক্ষক, কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার মহার্ঘভাতার টাকা কোথায় গেল এবং কেন বারবার কর্মচারীদের তাঁদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এখন প্রতিনিয়ত নির্বাচনে দুর্নীতির

● চতুর্থ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

জলপাইগুড়ি

বৃদ্ধি পাচ্ছে ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন

যত দিন যাচ্ছে ৯ জুলাই '২৫ ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী সংগঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গোটা দেশে ও রাজ্যে শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলির ক্ষেত্রে একথা যেমন সত্য, তেমনি রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং অবসরপ্রাপ্তদের সংগঠনসমূহের যৌথ মঞ্চের বাইরের অন্যান্য শক্তিও আসন্ন ধর্মঘটে শামিল হচ্ছে। দলমত নির্বিশেষে তারা যুক্ত হচ্ছে। এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে যৌথ মঞ্চ। যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী মঞ্চের অন্যান্য নেতৃত্বদের নিয়ে আগামী ৪ জুলাই ২ ঘণ্টার 'পেন ডাউন' কর্মসূচী এবং আগামী ৯ জুলাই সাধারণ ধর্মঘটে শামিল হবার জন্য সংগ্রামী যৌথ মঞ্চকে আহ্বান জানান এবং ঐ সংগঠনকে চিঠি দেওয়া হয়। ইতিবাচক সাড়া মেলে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চর পক্ষ থেকে। পরদিন ১ জুলাই দুটি যৌথমঞ্চের পক্ষ থেকে একসাথে সাংবাদিক সম্মেলন করে ৪ জুলাই 'পেন ডাউন' ও ৯ জুলাই ধর্মঘটে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে সকলকে শামিল হতে আহ্বান জানানো হয়। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী ইউনিয়ন-এর পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে কর্মবিরতি ও ধর্মঘটে সকল কর্মচারীদের শামিল হতে আহ্বান জানানো হয়েছে। সব মিলিয়ে ২০২৩ সালের ১০ মার্চের ঐতিহাসিক সফল ধর্মঘটের পূর্বেকার প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়েছে।

ষষ্ঠ বেতন কমিশনের নিদান

সরকারের মর্জি অনুযায়ী মহার্ঘভাতা পাওয়া যাবে

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে অবশেষে রাজ্য সরকার ষষ্ঠ বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করতে বাধ্য হল। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণিত করে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দিতে অস্বীকার করা হয়েছে ওই রিপোর্টে। রিপোর্টে ১২.৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "... Commission recommends that the State Government may from time to time decide the quantum of Dearness Allowance to be given to the employees taking into consideration the financial resources available to the State Government. The State Government shall not be required to adhere to the prevailing All India Consumer Price Index for the purpose of granting / or fixing and / or enhancing the quantum of Dearness Allowance."

অভিরূপ সরকারের নেতৃত্বে ষষ্ঠ বেতন কমিশন মহার্ঘভাতা প্রদান সম্পর্কে সেই কথাগুলিই লিপিবদ্ধ করেছে, যা ক্ষমতায় আসার পর থেকে মমতা ব্যানার্জী বলছেন। মোদ্দা কথা হল মহার্ঘভাতা মর্জি হলে কর্মচারীরা পাবে এবং কতটা পাবে সেটাও সরকার ঠিক করবে। এর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ জানিয়েছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ২৫ জুন '২৫। পরদিন ২৬ জুন, গোটা রাজ্যের প্রতিটি দপ্তরে এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ সভা হয়। ক্ষুব্ধ কর্মচারী সমাজ স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেয়। ক্ষোভে ঘৃতাহুতি পড়ে যখন রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো বকেয়া মহার্ঘভাতার ২৫ শতাংশ ২৭ জুনের মধ্যে মিটিয়ে দিতে অস্বীকার করে সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন দাখিল করে। যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে প্রতিবাদে এবং আসন্ন ধর্মঘটের সমর্থনে ৪ জুলাই বেলা ২টা থেকে ৪টা পেন ডাউন বা কর্মবিরতির কর্মসূচী ঘোষণা করে। ৩০ জুন আবার প্রতিটি দপ্তরে বিক্ষোভ সভায় ব্যাপক সাড়া দেন কর্মচারীরা। □

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির লাগাতার চাপ

ছুটি বাতিলের আদেশনামা প্রত্যাহারে বাধ্য হল সরকার

বিগত ৭ মে '২৫ পহেলগাঁও সন্ত্রাসবাদী হামলাকে বাহানা হিসেবে রেখে রাজ্য সরকার সমস্ত দপ্তরে কর্মচারীদের ছুটি বাতিলের আদেশনামা [নং ১৬৮৪-এফ (পি.২)] জারি করে। ঐ আদেশনামায় বলা হয় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নাগরিক পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে কর্মচারীদের মেডিকেল লিভ ছাড়া সব অনুমোদিত ছুটি বাতিল করা হল। একই সাথে বলা হল কোনো কর্মচারী নিজ দপ্তরের সর্বোচ্চ প্রধানের লিখিত অনুমতি ছাড়া হেড কোয়ার্টার ত্যাগ করতে পারবে না। ৭ মে '২৫ এই আদেশনামা প্রকাশের পরদিনই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এর প্রতিবাদে এবং এই আদেশনামা প্রত্যাহারের দাবিতে চিঠি দেয় অর্থ দপ্তরের বিশেষ সচিবকে।

কিন্তু রাজ্য সরকার এই বিষয়ে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ইতিমধ্যে ১৪ মে '২৫-এ কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রক আদেশনামা জারি করে ছুটি বাতিলের আদেশনামা প্রত্যাহার করে নেয়। এতে রাজ্য কর্মচারীদের ক্ষোভ মাত্রা ছাড়ায়। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সমস্ত কর্মচারী সমাজের ক্ষোভকে লিপিবদ্ধ করে ১৯ মে '২৫ পুনরায় ছুটি বাতিল সংক্রান্ত আদেশনামা বাতিলের দাবিতে অর্থ দপ্তরের বিশেষ সচিবকে পত্র দেয়। চিঠিতে উল্লেখ করা হয় যে—"এই বছরের ৩১ অক্টোবর রাজ্য সরকার ঘোষিত 'কর্মচারীদের জন্য বিনামূল্যে ভ্রমণ প্রকল্প বা এল টি সি-এর ব্লক ইয়ার শেষ হয়ে যাবে।... কিন্তু উপরোক্ত আদেশনামাটি বলবৎ থাকার কারণে তাঁদের কোনও প্রস্তুতিই গ্রহণ করতে পারছে না।'... পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুভব করে আপনি দ্রুত উপরোক্ত আদেশনামাটি বাতিলে উদ্যোগী হন।"

রাজ্য সরকারকে উপর্যুপরি পত্র দেওয়ার পাশাপাশি সাংগঠনিক নানা পর্যায়ের সভাগুলিকে এর বিরুদ্ধে প্রচারের কাজে ব্যবহার করা হয়। দ্বিবিধ চাপের কাছে অবশেষে হার মানে সরকার। ৪ জুন '২৫ একটি আদেশনামার [নং ২০৮৫-এফ (পি.২)] মধ্য দিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দাবিকে মান্যতা দিয়ে পূর্বের আদেশনামা প্রত্যাহার করে নেয় সরকার। তবে ভাঙব তবু মচকাব না-র মতো করে আদেশনামাটি পুরোপুরি প্রত্যাহার না করে আপাতত স্থগিত রাখার কথা বলা হয়েছে।

স্বৈরাচারী সরকারের কাছ থেকে এই ধরনের দাবি আদায় কর্মচারী আন্দোলনকে উজ্জীবিত করবে কোনো সন্দেহ নেই। একই সাথে কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণে প্রশাসনের অভ্যন্তরে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি চ্যাম্পিয়ন তা আবার প্রমাণিত হল। □

সংগ্রামী হাতিয়ার

জুন, ২০২৫

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

তেপান্নতম বর্ষ □ দ্বিতীয় সংখ্যা □ মূল্য ঃ ২ টাকা

সম্পাদকীয়

আসলে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব

দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের নির্দেশ না মানার স্পর্ধা দেখালো পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পঞ্চম বেতন কমিশনের কার্যকালে কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া মহার্ঘভাতার অন্তত ২৫ শতাংশ কর্মচারীদের দিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছিল মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট। ঐ সংক্রান্ত মামলাতে এটা ছিল অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ। বলা হয়েছিল যে সেই নির্দেশ প্রদানের ৬ সপ্তাহের মধ্যে অর্থাৎ ২৭ জুন, '২৫-এর মধ্যে বকেয়ার ২৫ শতাংশ কর্মচারীদের দিতে হবে। তারপর থেকে রাজ্য সরকারের এই প্রসঙ্গে কোনো বক্তব্য বা আলোচনা প্রকাশ্যে আসেনি।

২০১১ সালের পর থেকে রাজ্য সরকারের ভূমিকা থেকে লব্ধ অনিশ্চতায় এই রাজ্যের সরকারী কর্মচারীরা সিঁদুরে মেঘ দেখতে পাচ্ছিলেন। যতদিন এগোতে থাকে ততই কর্মচারীদের মনে এই ধারণা দানা বাঁধতে থাকে যে রাজ্য সরকার বকেয়া না দেবার কৌশল সাজাচ্ছে। অবশেষে চূড়ান্ত দিনে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে বকেয়া দিতে পারবে না এই বক্তব্য কর্মচারীদের যতটা না হতাশ ও ক্ষুব্ধ করেছে তার বহু গুণ ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে বক্তব্যের আরেকটি অংশে। রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে বলেছে যে তারা ঐ অর্থ কর্মচারীদের না দিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জমা রাখতে পারে। কারণ হিসাবে সরকার বলে যে, এই অন্তর্বর্তী রায় যে মামলার সূত্র ধরে তার চূড়ান্ত রায়ে যদি বকেয়া মহার্ঘভাতা দিতে হবে না বলা হয় তাহলে কর্মচারীদের ঐ অর্থ প্রদান করলে তা আর ফেরত পাওয়ার সুযোগ নেই। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করার মধ্য দিয়ে এই রাজ্য সরকার দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়কে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মতোই এক্ষেত্রে তাদের আচরণ। দ্বিতীয়ত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের থেকে অর্থ ফেরত পাওয়া যাবে না এই বক্তব্য সমস্ত কর্মচারী সমাজকে অপমান করার ঔদ্ধত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। রাজ্য সরকারের বক্তব্যের মোদ্দা কথা হলো—সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় বললেও আমি দেব না, আমি আমার খুশি মতো দেব। এটাই তো স্বৈরাচারী প্রবণতা। যে স্বৈরাচার আদালত, সংবিধানের তোয়াক্কা করে না।

২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্য সরকার প্রথম দিকে হাবেভাবে, পরবর্তীকালে সরাসরি বলে দিয়েছে যে কেন্দ্রীয় হারে অর্থাৎ অল ইন্ডিয়া কনসিউমার্স প্রাইস ইনডেক্স বা এ আই সি পি আই অনুযায়ী রাজ্য সরকার ডি.এ. দেবে না, তার মর্জি মতো দেবে। কারণ রাজ্য সরকার মনে করে ডি.এ. পাওয়াটা কর্মচারীদের অধিকারের মধ্যে পড়ে না। হাইকোর্টের নির্দেশে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ষষ্ঠ বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে সরকার। সেই রিপোর্টে সরকারের ডি.এ. প্রদানের বিষয়ে মনোভাব পরিষ্কার হয়েছে। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের চেয়ারম্যান রাজ্য সরকারের মত অনুযায়ী বলেছেন এই ধারণা আমাদের কাছে বদ্ধমূল হয়েছে। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের রিপোর্টের ১২.৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাজ্য সরকার কতটা ডি.এ. দেবে, কোন সময় দেবে তা সরকার তার অবস্থা বুঝে ঠিক করবে। পূর্বের মতো এ আই সি পি আই অনুযায়ী ডি.এ. দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আঁকড়ে থাকার প্রয়োজন নেই। মুখ্যমন্ত্রী সবসময় ডি.এ. প্রসঙ্গে এই মানসিকতাকেই তো প্রকাশ করেন। ষষ্ঠ বেতন কমিশনে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যই লিখিতভাবে পেশ করা হয়েছে।

বামফ্রন্ট আমলে শেষ অর্থাৎ পঞ্চম বেতন কমিশন তার রিপোর্টে পরিষ্কার বলেছিল কর্মচারীরা এ আই সি পি আই অনুযায়ী কেন্দ্রীয় হারে ডি.এ. পাবে। পঞ্চম পে কমিশনে ডি.এ. প্রসঙ্গে এই স্পষ্ট বক্তব্যের ভিত্তিতেই রাজ্যের হাইকোর্ট বলেছিল যে ডি.এ. কর্মচারীদের নৈতিক অধিকার এবং বকেয়া মহার্ঘভাতা রাজ্য সরকারকে দিতে হবে। সে রায়কে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে যায় এবং সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি একটি অন্তর্বর্তী নির্দেশের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকারকে বকেয়া ডি.এ.-র ২৫ শতাংশ কর্মচারীদের প্রদান করতে বলে। যে নির্দেশ রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে উপেক্ষা করেছে। একটি রাজ্য সরকারের তার কর্মচারীদের প্রতি মনোভাব ও তার রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব এর দ্বারা ফুটে ওঠে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজ্যে আর্থিক সঙ্কট ছিল না তা ওই সরকারের চরম বিরোধীও বলতে পারবে না। সেই সময়েও কখনও কখনও কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদানে অনেক বিলম্ব হয়েছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি কি মনে করে রাজ্য সরকার তার অন্যান্য সব পরিষেবা শিকেয় তুলে দিয়ে শুধু কর্মচারীদের ডিএ মিটিয়ে যাবে? না, আমরা এতে বিশ্বাস করি না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছিল বলেই মহার্ঘভাতা প্রদানে বিলম্ব ঘটলেও কর্মচারীদের কাছে সরকারের সমস্যার কথা তুলে ধরত, বর্তমান সরকারের মতো কর্মচারীদের সারমেয়র সাথে তুলনা করেনি কখনও। বামফ্রন্ট সরকারের শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবিদাওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে মনোভাব সবসময় ছিল ইতিবাচক। বামফ্রন্ট আমলের ৩৪ বছরে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক অধিকার অর্জনের পরিসংখ্যান একটা ইতিহাস হয়ে গেছে। এই সরকার নিজেরা অবগত ছিল যে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদান সহজ কাজ নয়। তা সত্ত্বেও পঞ্চম বেতন কমিশনের রিপোর্টের মাধ্যমে রাজ্য কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্তদের কাছে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দেওয়ার আইনি অঙ্গীকার করে গেছে। ২০১১ সালে বিদায় নেওয়া একটি সরকারের কর্মচারীদের স্বার্থে ইতিবাচক মনোভাবের সুফল তার ১৪ বছর পরেও পাচ্ছে এ রাজ্যের কর্মচারী সমাজ।

তৃণমূল সরকারের মূল দৃষ্টিভঙ্গী যেহেতু শ্রমিক-কর্মচারী বিরোধী, তার কার্যকলাপে তার রেশ ফুটে ওঠে। তাই আমাদের আবার চিরাচরিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ফিরে যেতে হবে। বিচার ব্যবস্থা সবটা করে দিতে পারে না তা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি বার বার বলেছে। সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়ের পরেও আমরা বলেছিলাম যে এই সরকার যাতে মান্য করতে বাধ্য হয় আমাদের তার জন্য রাস্তায় থাকতে হবে। আমরা সে পথেই আছি। সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়, ষষ্ঠ বেতন কমিশনের রিপোর্টে ডি.এ.-কে দয়ার দানে পরিণত করা এবং সপ্তম বেতন কমিশন অবিলম্বে গঠন করা—ইত্যাদির দাবিতে আমরা আরও বৃহত্তর ঐক্য সৃষ্টি করে রাজপথে সংগ্রামে আছি।

মনে রাখতে হবে আজ পর্যন্ত তৃণমূল সরকারের কৃপণ হাত থেকে যতটুকু দাবি আদায় করা গেছে তা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। ২০১১ সালের ২২ নভেম্বর কলকাতায় কেন্দ্রীয়ভাবে এবং জেলায় জেলায় এই সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে ৮ ডিসেম্বর '১১ এই আমলে প্রথমবার মহার্ঘভাতা প্রদানের কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল এই সরকার। ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের জন্য দুই বছর টানা সংগ্রাম করেছিল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। সর্বশেষ ২৪ নভেম্বর '১৫ সারা রাজ্যে টিফিন বিরতিতে বিক্ষোভ কর্মসূচীর ব্যাপক সাফল্যে চাপে পড়ে তৃণমূল সরকার ২৯ নভেম্বর '১৫ ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের নির্দেশিকা জারি করে। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী হয়েছিল কর্মচারীদের লাগাতার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। একদম আজকের সময়ে চলে আসি, পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলাকে অজুহাত করে কর্মচারীদের ছুটি বাতিলের আদেশনামা প্রত্যাহারে সরকার বাধ্য হয় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির লাগাতার চাপের ফলে। কাজেই সাফল্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে থাকে সংগ্রামের গভীরে।

বামফ্রন্ট সরকারের শেষ দিকে ২০০৮ থেকে ২০১০ সাল, যখন নানাভাবে এই সরকারকে ফেলে দেওয়ার চক্রান্ত চূড়ান্ত রূপ দিচ্ছে সেই তিন বছরে আট কিস্তিতে ৩৫ শতাংশ মহার্ঘভাতার দিয়েছিল সেই সরকার। তৃণমূল সরকার আসার পর প্রথম তিন বছরে মাত্র তিন কিস্তি মহার্ঘভাতা প্রদান করে। সঙ্কট ২০০৮-এর তুলনায় ২০১৪-তে কয়েক শতগুণ বেড়ে যায়নি। প্রশ্নটা হল রাজনৈতিক সদিচ্ছার। বামফ্রন্ট সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছিল বলেই এ আই সি পি আইকে মহার্ঘভাতা প্রদানের ভিত্তি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে গেছে। তৃণমূল সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী কর্মচারী বিরোধী বলেই তারা মহার্ঘভাতাকে মুখ্যমন্ত্রীর দয়ার দান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

তৃণমূল সরকারের শ্রমিক কর্মচারীদের সংগঠন-সংগ্রামে এলার্জি প্রবল। এই সরকারের রাজনৈতিক দর্শনে সংগ্রামকে মান্যতা না দেওয়াটাই প্রধান বিষয়। এরা আমাদের যখন খুশি মহার্ঘভাতা দেবে এটা যেমন চায়, তেমনি এরা চায় ডি.এ.-র দাবিতে আমরা কোনো আন্দোলন সংগ্রাম না করে খালি নিষ্ক্রিয় গ্রাহক হয়ে যেন থাকি।

সরকারের এই অবস্থান বদলাতে যথোচিত লক্ষ্য আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামের ময়দানে নামা। যে কোনো স্বৈরাচারী সরকার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে ভয় পায়। শাসকের চোখে চোখ রেখে সংগ্রাম ওদের আতঙ্কিত করে। বর্তমান রাজ্য সরকারকেও সঠিক পথে আনতে গেলে আদালতের রায় সহায়ক শক্তি হতে পারে, কিন্তু জোরালো ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ছাড়া বিকল্প কিছু নেই।

সেই জমি তৈরী হয়েছে। আগামী ৪ জুলাই '২৫ ২ ঘণ্টার পেন ডাউন কর্মসূচীকে সফল করে সেই সাফল্যের উপর ভিত্তি করে আগামী ৯ জুলাই আমাদের দাবিদাওয়া সহ শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে দেশজোড়া সাধারণ ধর্মঘটে শামিল হয়ে রাজ্য প্রশাসনকে স্তব্ধ করে দেবে কর্মচারী সমাজ।

এছাড়া বিকল্প কোনো রাস্তা নেই। □

২৫ জুন, ২০২৫

ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ২৫তম সম্মেলন

ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ২৫তম সম্মেলন ৩১ মে ২০২৫, শনিবার কমরেড বরুণ কুমার সরকার মঞ্চে (দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির দপ্তর) আলিপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সম্মেলনের শুরুতে সম্মেলন স্থল থেকে বিজি প্রেস, আলিপুর এলাকা দিয়ে চেতলা পর্যন্ত মিছিল যায় এবং সম্মেলন স্থলে পুনরায় ফিরে আসে। ফ্লাগ, ফেস্টুন সম্বলিত দৃপ্ত বর্ণাঢ্য মিছিল এলাকার মানুষের নজর কাড়ে।

রক্তপতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। রক্তপতাকা উত্তোলন করেন ইউনিয়নের সভাপতি অমিত ব্যানার্জী। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন সভাপতি, অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি রজত সাহা, ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ, অভ্যর্থনা কমিটির উপদেষ্টাবৃন্দ, সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক সহ ইউনিটগুলির সম্পাদক ও ভ্রাতৃপ্রতিম সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ।

এরপর কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায় প্রগতিশীল সাহিত্য বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি রজত সাহা। সম্মেলনের শুরুতে সাংস্কৃতিক উপসমিতি গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন। সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয় ইউনিয়নের সভাপতি অমিত ব্যানার্জী, সহ সভাপতিবৃন্দ সুভাষ সিংহ, জ্যোর্তিময় সেন ও প্রবীণ নেতৃত্ব অরুণ কর্মকারকে নিয়ে। শোকপ্রস্তাব পাঠ ও নীরবতা পালনের পর অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি স্বাগত ভাষণ রাখেন।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুতপা হাজরা। তিনি তাঁর বক্তব্যে বিজি প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের লড়াইয়ের ইতিহাস তুলে ধরেন এবং বর্তমান সময়ে যে লড়াই চলছে তারও উল্লেখ করেন। বর্তমান রাজ্যের সরকার বি জি প্রেস, আলিপুরকে বন্ধ করে দিয়ে কর্মচারীদের বিভিন্ন অফিসে ডেপুটেশনে বদলি করেছে। এর বিরুদ্ধে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে বি জি প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের লড়াই হয়েছে তা বক্তব্যে বলেন। সরকারী ছাপার কাজ সরকারী প্রেসগুলো থেকে করাতে হবে এবং বি জি প্রেস, আলিপুরকে খুলতে হবে—দাবিতে বি জি প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের লড়াইতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি থাকবে—এই কথাও বলেন। শ্রমকোড বাতিল সহ অন্যান্য দাবিতে আগামী ৯ জুলাই ২০২৫ সারা ভারত ধর্মঘটের প্রচার সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার আবেদন করেন।

ইউনিয়নের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও প্রবীণ নেতৃত্ব সন্দীপ বিশ্বাস সম্মেলনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক সুমন দত্ত। আয়ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন দেবরানা মজুমদার। প্রস্তাবাবলী পেশ করেন সহ সম্পাদক অশোক ঘোষাল, সর্মথনে বক্তব্য রাখেন দপ্তর সম্পাদক জয়দীপ ভট্টাচার্য। আগামী ৯ জুলাই ২০২৫ শ্রমকোড বাতিল সহ অন্যান্য দাবিতে আহূত সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে পৃথকভাবে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। প্রস্তাবটি পেশ করেন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কাঞ্চন দত্ত। উপস্থিত প্রতিনিধিদের করতালির মাধ্যমে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

দুপুরের আহারের পর সম্মেলনের ২য় পর্ব শুরু হয়। শুরুতেই বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আইনজীবী শামিম আহমেদ। তিনি বি জি প্রেস রক্ষার লড়াইকে ও সম্মেলনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের সামগ্রিক আক্রমণের কথা তুলে ধরেন।

সম্মেলনের নির্ধারিত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী "সমাজমুখী ভাবনায় সাথী হোক পরিবার"—শীর্ষক আলোচনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সহ সম্পাদক প্রবীর মুখার্জী। তিনি বলেন, কেন্দ্রের সরকার উগ্র দক্ষিণপন্থার নীতি নিয়ে মানুষকে ধর্মের নামে, জাতের নাম ভাগ করে শাসন করছে। এদিকে রাজ্য সরকারও প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িক নীতি নিয়ে শাসন করছে। সমাজের সর্বস্তরে বিভ্রান্তি কায়েম করছে। বি জি প্রেস আলিপুরকে বন্ধ করে দিয়েছে, সরকারী জমি বিক্রি করছে, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, অভয়াকাণ্ড সহ রাজ্যজুড়ে চুরি, দুর্নীতি, লুট, মহার্ঘভাতা না দেওয়া—প্রভৃতির বিরুদ্ধে লড়তে গেলে পরিবার পরিজনসহ সমাজের সকলকে যুক্ত করার আহ্বান জানান।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর মোট ৯ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। সবটা গুটিয়ে এনে সাধারণ সম্পাদক বাবলু ঘোষ জবাবী বক্তব্য রাখেন।

অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক পৃথকভাবে সম্মেলনে উপস্থিতির তথ্য প্রদান করেন এবং সকলকে সম্মেলন সফল করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিদায়ী কমিটির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক ৩১ জনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সভা থেকে সভাপতি পদে বাবলু ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক পদে জয়দীপ ভট্টাচার্য, যুগ্ম সম্পাদক পদে কাঞ্চন দত্ত ও কোষাধ্যক্ষ পদে রাহুল দেব নির্বাচিত হন।

সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে অরুণ কর্মকার সমাপ্তি ভাষণ দেন এবং আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কাজ শেষ হয়। □

শোক সংবাদ

কমরেড অমলেশ ঘোষ

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নব মহাকরণ অঞ্চলের প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড অমলেশ ঘোষের জীবনাবসান হয়েছে গত ১৫ জুন, ২০২৫। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনী রয়েছেন। কমরেড অমলেশ ঘোষ বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন।

কমরেড ঘোষের মৃত্যুতে সংগঠন হারাল সদা হাস্যময়, সকলকে জড়িয়ে থাকা এক প্রাণবন্ত সংগঠককে। তাঁর স্নেহের স্পর্শ সেই সময়ের সংগঠনের সকল সাথীর মন ছুঁয়ে আছে।

তাঁর শোকাহত পরিবারকে জানাই সমবেদনা। তাঁর স্মৃতির প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

কমরেড অমলেশ ঘোষ লাল সেলাম।

কমরেড অমলেশ ঘোষ অমর রহে।

৯ জুলাই ধর্মঘট

প্রেক্ষাপট ও করণীয়

প্রণব কর

ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়া জেলার বাচেলি শহরে ন্যাশনাল মিনেরাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের (NMDC) আধিকারিকরা গত মার্চ মাসে একটি নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়ে শ্রমিকদের জানিয়ে দেন যে এখন থেকে ফেসিয়াল বায়োমেট্রিকের মাধ্যমে তাদের হাজিরা দিতে হবে। শ্রমিকরা প্রতিবাদ করেন, বলেন যে এর আগে এ জাতীয় কোনো পরিবর্তন করতে হলে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করেই তা ঠিক করা হত। যেহেতু তাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা ছাড়াই এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে তাই তাঁরা এই হাজিরা-ব্যবস্থা মানবেন না। শ্রমিকরা ইউনিয়নকে নিয়ে লেবার কমিশনে আপীল করে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বিষয়টির কোনো ফয়সালা হয়নি, আবেদনটি কেন্দ্রীয় লেবার কমিশনের ডেপুটি চিফের টেবিলে পড়ে আছে। শ্রমিকরা বায়োমেট্রিক হাজিরা অস্বীকার করায় তাঁদের অনুপস্থিত বলে দেখানো হচ্ছে, তাঁদের কোনও কাজ দেওয়া হচ্ছে না, মাইনে কেটে নেওয়া হচ্ছে, যদিও তাঁরা রোজই অফিসে হাজিরা দিচ্ছেন। শ্রমকোড চালু হবার আগেই একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় এই অরাজকতা চলছে। শ্রমকোড চালু হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে।

কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে অস্বাভাবিক দ্রুততায় চারটি শ্রমকোড সংসদে পাশ করিয়ে লাগু করা হয়। এই চারটি শ্রমকোডের মধ্যে চালু ২৯টি শ্রম আইনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ওয়েজ কোডে চারটি শ্রম আইন; সোস্যাল সিকিউরিটি কোডে ৯টি আইন; অকুপেশনাল সেফটি কোডে ১৩টি শ্রম আইন এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্রমকোডে ৩টি শ্রম আইন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শ্রমকোডের মধ্য দিয়ে চালু শ্রম আইনগুলিকে নখদন্তহীন করে ফেলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজির আদেশ অনুযায়ী নমনীয় শ্রম বাজার তৈরী করার উদ্দেশ্যেই এই চারটি শ্রমকোড চালু করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে ১৬ অক্টোবর শ্রম আইনগুলিকে সংশোধন করার উদ্দেশ্যে 'শ্রমেব জয়তে' বলে একটি স্কীম চালু করে। এর মধ্য দিয়ে ইন্সপেক্টর পদকে অ্যাডভাইজার পদে পরিণত করে মালিকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তদন্ত করার প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়া হল। শ্রমিকদের নামকরণ করা হল শ্রম-যোগী, যেন অধিকার বোধহীন ত্যাগের প্রতীক তাঁরা।

তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসে মোদী সরকার আরও আগ্রাসী ভাবে শ্রমবাজার সংস্কার করতে সচেষ্ট হয়েছে। শ্রমকোড পাশ হয় ২০১৯ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে। এই আইনের বিধিগুলি তৈরী করে এ বছরের এপ্রিল মাস থেকে কোডগুলি লাগু করার পরিকল্পনা নিয়েছিল সরকার। কিন্তু এখনও পর্যন্ত শ্রমজীবী মানুষের প্রতিরোধের জন্য তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই কোডগুলি চালু হলে ভারতের শ্রমজীবী মানুষ আসলে শ্রমদাসে পরিণত হবে। ইউনিয়ন করার অধিকার, ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন করা, মালিকশ্রেণীর সঙ্গে সমবেত দর কষাকষি, বিক্ষোভ প্রদর্শন, সমবেতভাবে প্রতিবাদ করা, ধর্মঘট করার অধিকার সম্পূর্ণ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। শ্রমকোড হচ্ছে শ্রম দাসত্বের নীল নকশা। সমবেতভাবে ইউনিয়নের কোনো কাজ করা, এমনকি সমবেতভাবে মালিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ জানানো পর্যন্ত ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১১১ ধারা অনুযায়ী 'সংগঠিত অপরাধ' বলে গণ্য হবে। এই অপরাধের জন্য শ্রমিক এবং তাঁর নেতৃত্বদের জামিন অযোগ্য ধারায় পুলিশ জেলে পুরে দিতে পারবে। গেট মিটিং, লিফলেট বিলি, মেমোরেন্ডাম দেওয়ার মতো দৈনন্দিন কাজগুলিও অপরাধমূলক কাজ বলে পরিগণিত হবে।

'ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস' কোডের মধ্য দিয়ে ছাঁটাই, কারখানা বন্ধ এবং লে-অফ করা অনেক সহজসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। ৫০-এর কম শ্রমিক রয়েছে যেসব কারখানায় সেখানে লে-অফ হলে তার জন্য শ্রমিকদের কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। শিল্প সংস্থায় ধর্মঘট নিষিদ্ধ করা হয়েছে এই কোডের মাধ্যমে। ধর্মঘট করতে গেলে ৬০ দিন আগে ধর্মঘটের নোটিশ দিতে হবে—যা ধর্মঘট করা আরও কঠিন করে তুলবে। বর্তমান শিল্পবিরোধ আইন অনুযায়ী যদি কোনো সংস্থায় ১০০ বা তার বেশি শ্রমিক কাজ করে তবে ঐ সংস্থার কর্তৃপক্ষকে লে-অফ, ছাঁটাই, ক্লোজারের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারের অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু কোড চালু হলে শ্রমিকের সংখ্যা ৩০০ হয়ে যাবে। ফলে বর্তমানে দেশের ৭০ শতাংশ কর্মরত শ্রমিকের চাকুরির স্থায়িত্ব মালিকের দয়ার উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। এই কোডে মালিকদের অধিকার দেওয়া হয়েছে চুক্তির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কর্মী নিয়োগ করতে পারার। গ্রিভেন্স রিড্রেসাল কমিটির সঙ্গে আলোচনা করেই কাজের শর্তাবলীর পরিবর্তন করে দেওয়া যাবে, এ বিষয়ে কোনো নোটিশ জারি করার প্রয়োজনীয়তা আর থাকবে না। এমনকি প্রশাসনিক আদেশনামা জারি করে শ্রমকোড আইনের পরিবর্তনের সুযোগ রাখা হয়েছে এই আইনে। ধর্মঘট করলে শ্রমিকদের জেল, জরিমানা করা হবে। এই ধর্মঘটে যারা মদত দেবে বা সমর্থন করবে তাদেরও জরিমানা, জেল হতে পারে।

কোড অন ওয়েজেস অ্যাক্ট, ২০১৯-এর মধ্য দিয়ে বিচার ব্যবস্থার ভূমিকা কমিয়ে প্রশাসনিক ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে শ্রমিকদের মজুরি সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তির জন্য। স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে মালিকপক্ষের হাত শক্তিশালী হবে। ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য সুস্পষ্ট নীতির বদলে অস্পষ্টতা তৈরী হয়েছে। ন্যূনতম মজুরি না পেলে কোথায় তার বিচার হবে সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কোথাও লেখা নেই। এই কোড অনুযায়ী এখন থেকে প্রতি ঘণ্টার মজুরি ঘোষণা করা হবে।

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি বারবার করে কেন্দ্রীয় সরকারকে মালিক, শ্রমিক ও সরকারকে নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করতে আবেদন করেছে চারটি কোড নিয়ে আলোচনার জন্য। এই ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের সর্বোচ্চ ফোরাম হচ্ছে ইন্ডিয়ান লেবার কনফারেন্স (ILC)। গত দশ বছর ধরে আই এল সি-এর বৈঠক হচ্ছে না। ট্রেড ইউনিয়নগুলি আবেদন করেছিল আই এল সি-এর বৈঠক ডেকে শ্রমকোডগুলির আলোচনার জন্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার শ্রম মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে খসড়া শ্রমকোড প্রকাশ করে দেয় ২০১৭ সালে কোনোরকম পূর্ববর্তী ঘোষণা ছাড়াই। প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠার এই খসড়া অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে তুলে নেওয়া হয়। ফলে প্রথম থেকেই এই কোডগুলি নিয়ে অস্বচ্ছতা ছিল। ২০১৯ সালে চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশ করা হয়। ২০২০ সালের ২১ নভেম্বর এই কোডের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় ধর্মঘট ডাকে কেন্দ্রীয় ইউনিয়নগুলি। ২০২১ সালে এই আইনের বিধি তৈরির জন্য ইউনিয়নের মতামতের জন্য বৈঠক ডাকা হয়। ইউনিয়নগুলিকে মাত্র কয়েক মিনিট করে সময় দেওয়া হয় আলোচনার জন্য। স্বাভাবিকভাবেই ইউনিয়নগুলি এই প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি। শ্রমিক শ্রেণীর ব্যাপক লড়াইয়ের ফলে এই কোডগুলিকে এখনও প্রয়োগ করতে পারেনি কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু সরকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে কোডগুলিকে প্রয়োগ করতে। এই প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে আগামী ৯ জুলাই-এর ধর্মঘটের গুরুত্ব আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

পাশাপাশি ভারতের ক্ষুধা, অসাম্য, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব বর্তমান সময়ে এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

১৯৭৩-৭৪ সালে ভারতে দারিদ্র্য পরিমাপের সূচনা হয়। গ্রামীণ ক্ষেত্রে যারা ২,২০০ কিলো ক্যালোরি এবং শহরে ২,১০০ কিলো ক্যালোরি খাদ্য সারাদিনে গ্রহণ করতে পারে না, তাদের দরিদ্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

এই হিসাব অনুযায়ী ১৯৭৩-৭৪ সালে গ্রামীণ ক্ষেত্রে দরিদ্র মানুষের শতকরা হার ছিল ৫৬ শতাংশ। ২০১৭-১৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮০ শতাংশের উপর। শহরে এই দুটি সময় পর্বেই দারিদ্র্যের হার ছিল ৬০ শতাংশ। ২০১৭-১৮ সালে দারিদ্র্যের হারের এই বিপুল বৃদ্ধির ফলে সরকার এই সংক্রান্ত তথ্য দেওয়াই বন্ধ করে দিল। কিন্তু পরবর্তীকালে করোনা অতিমারি, লকডাউন ইত্যাদির ফলে দারিদ্র্যের হার আরও বৃদ্ধি পেয়েছে তা নিশ্চিত বলা যায়। অন্যান্য বিভিন্ন তথ্য এই বক্তব্যকেই প্রতিষ্ঠা করছে। ২০১৫-১৬ সালে যেখানে মহিলাদের মধ্যে অ্যানিমিয়াতে আক্রান্তের হার ছিল ৫৩ শতাংশ, ২০১৯-২১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫৭ শতাংশ।

থমাস পিকেটির দেওয়া তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে ২০২২ সালে ভারতের জনসংখ্যার উপরের ১ শতাংশ মোট আয়ের ২২.৬ শতাংশ এবং মোট সম্পদের ৪০.১ শতাংশ দখল করে আছে। আয়ের এই অসাম্য তৈরী হয়েছে, ভারতের ধনীতম ব্যক্তিরা ইউরোপের ধনীতম ব্যক্তিদের থেকে বেশি ধনী আবার ভারতের গরিবতম অংশ, মাদাগাস্কারের দরিদ্রতম অংশের মানুষের থেকেও দরিদ্র। গত ১০ বছরে ১৭ শতাংশ দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে ভারতে। আয়ের এই অসাম্যের ফলে ভারতীয় বাজারে চাহিদা বিপুলভাবে হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে উৎপাদনে তৈরি হয়েছে স্থবিরতা, বৃদ্ধি পাচ্ছে বেকারত্ব। সি এম আই ই-এর তথ্য অনুযায়ী ২০০৮ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত সময়কালে ভারতবর্ষে বেকারত্বের হার ছিল ৫-৬ শতাংশ। পরবর্তীতে বৃদ্ধি পেয়ে তা মার্চ, ২০২৪-এ দাঁড়ায় ৮ শতাংশ। এর মধ্যে আবার আই এল ও-এর হিসাব অনুযায়ী ভারতে ১৫-২৯ বছর বয়সী তরুণ-তরুণীদের মধ্যে বেকারত্বের হার ২০২২ সালে ছিল ১৫.১ শতাংশ। তরুণদের মধ্যে শিক্ষার হার যত বেশি বেকারত্বের হারও তত বেশি। ভারত প্রকৃতপক্ষে গত দু'দশক ধরে কর্মসংস্থানবিহীন বৃদ্ধির সাক্ষী হয়ে রয়েছে। ২০২৫ সালের ১৫ জুন কেন্দ্রীয় সরকার কর্মসংস্থান সংক্রান্ত যে তথ্য প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে ১৫-২৯ বছর বয়সী ভারতীয়দের মধ্যে বেকারত্বের হার ১৫ শতাংশ। কিন্তু এই রিপোর্টের মধ্যে যে ভয়াবহতা রয়েছে তা হলো কর্মসংস্থানের নতুন সংজ্ঞা। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি সপ্তাহে ১ ঘণ্টা কাজ করে থাকেন তবে তিনি কর্মরত। ইতিমধ্যেই ওয়েজ কোডে প্রতি ঘণ্টায় কত মজুরি হবে তা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। যদি মালিক মনে করে কোনো একজন শ্রমিককে ২ ঘণ্টার জন্য নিয়োগ করবে তবে শ্রমিককে মালিক দু'ঘণ্টার জন্যই মজুরি দেবে, পুরো দিনের মজুরি দেবে না। ফলে মজুরি আরও হ্রাস পাবে। বর্তমানে কর্মরতদের যে সংজ্ঞা সরকার তৈরী করেছে তাতে সপ্তাহে ১ ঘণ্টা অর্থাৎ মাসে ৪ ঘণ্টা কাজের সুযোগ পেলেই একজন শ্রমিককে কর্মরত বলে ধরে নেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গে এখন দৈনিক ন্যূনতম মজুরি ৩৬৩ টাকা, ৮ ঘণ্টা কাজের জন্য। ফলে ১ ঘণ্টা দৈনিক কাজের মজুরি হয় ৫০ টাকারও নীচে। মাসে চার ঘণ্টা কাজের মজুরি ২০০ টাকারও কম হয়। সংজ্ঞাগতভাবে মাসে ২০০ টাকা উপার্জন করলেও একজন শ্রমিক কর্মরত বলে ধরে নেওয়া হবে। যদি ঐকিক নিয়মের উপর নির্ভর করে ১ ঘণ্টার মজুরি নির্ধারণ নাও করা হয়, তাহলেও তা ৫০ টাকার বদলে খুব বেশি বৃদ্ধি পাবে না নিশ্চয়। ফলে কর্মরত আর বেকারের মধ্যে পার্থক্য কার্যত মুছে ফেলা হচ্ছে।

রেগার কাজের চাহিদা থেকেও ভারতের বেকারত্বের একটা ধারণা আমরা করতে পারি। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে রেগাতে ২৬৫.৩ কোটি শ্রমিক-দিবসের চাহিদা ছিল। অতিমারির সময়ের দুটি অর্থবর্ষে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৮৯.৯ কোটি শ্রমিক-দিবস ও ৩১৩.২ কোটি শ্রমিক-দিবস। কিন্তু অতিমারি শেষ হয়ে গেলেও ২০২৩-২৪ সালে শ্রমিক-দিবসের চাহিদা ছিল ৩০৫.২ কোটি, যা অতিমারি পূর্ববর্তী ২০১৯-২০ সালের তুলনায় ১৫ শতাংশ বেশি।

একই সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে অটোমেশন এবং AI-এর ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। এর ফলে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমশক্তির প্রয়োজনীয়তা কমছে বিপুলভাবে। উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর অটোমোবাইল ও টেলিকম ক্ষেত্রে 3D প্রিন্টিং সহ বিভিন্ন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কারখানার অ্যাসেম্বলি লাইনে নজরদারির ক্ষেত্রে, পরিবহনে, রসদ যোগানের ক্ষেত্রে এমনকি শিল্পদ্রব্য গুদামজাত করবার ক্ষেত্রেও শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা কমছে। ২০১৮ সালে আই এল ও ভারতের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রভাবে শ্রমক্ষেত্রে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটছে, তার উপর একটি রিপোর্টে বলছে যে এর ফলে স্বল্প-দক্ষতার ৬,৪০,০০০ ধরনের কাজ নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার বদলে ১, ৬০,০০০ মধ্য বা উচ্চ-দক্ষতার কাজ তৈরী হবে।

বর্তমানে ভারতের তরুণ প্রজন্মের একটি বড় অংশ গিগ শ্রমিক হিসেবে কর্মরত। কিন্তু এই জাতীয় কাজের যা চরিত্র তাতে কর্মীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত সুরক্ষা, অবসরকালীন সুবিধা, ছুটি এবং কাজ না থাকাকালীন সময়ে কোনো আর্থিক সুবিধা পাবার কোনো সুবিধা নেই। ফলে গিগ কর্মীরা অসুস্থ হয়ে পড়লে বা বাজারে ধস নামলে ভয়াবহ আর্থিক বিপদের সম্মুখীন হন। সামাজিক সুরক্ষা কোডে গিগ ও প্লাটফর্ম কর্মীদের জন্য কিছু সামাজিক সুরক্ষার কথা বলা হলেও তা প্রকৃত ক্ষেত্রে কতদূর বাস্তবায়িত হবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার জন-বিশ্বাস আইন প্রণয়ন করে গত কয়েক বছরে মালিক পক্ষের একাধিক অপরাধমূলক পদক্ষেপকে অপরাধ তালিকার বাইরে বের করে এনেছে। বয়লার আইন, অরণ্য আইন, চা-শিল্প সংক্রান্ত আইন ইত্যাদি ৪১টি আইনের অন্তর্গত ১৮০টি অপরাধকে অপরাধ তালিকার বাইরে বের করে আনা হয়েছে। শুধুমাত্র কিছু আর্থিক জরিমানা দিয়ে তারা ছাড় পেয়ে যাচ্ছে। ২০২৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে "Ease of doing Business"-এর নামে আরও ১০০টি গর্হিত অপরাধকে তালিকার বাইরে বের করে আনার কথা বলা হয়েছে। শ্রমকোডগুলি চালু হবার আগেই শ্রমিকদের অভিযোগ নথিভুক্ত করে ও তার মধ্য দিয়ে মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য যে দুটি পোর্টাল ছিল—শ্রম সমাধান ও শ্রম সুবিধা পোর্টাল—তা কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

পাশাপাশি সাধারণ মানুষের উপর বিপুল কর বসিয়ে সরকারের যে রাজস্ব সংগ্রহ হচ্ছে তার একটা বড়ো অংশ সরকার খরচ করছে সামান্য কিছু শিল্পপতিদের বিভিন্ন ইনসেনটিভ দেবার জন্য। প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেনটিভ হিসেবে ১৪টি উৎপাদন ক্ষেত্রকে ১.৯৭ লক্ষ কোটি টাকা, এমপ্লয়মেন্ট লিঙ্কড ইনসেনটিভ হিসেবে ২ লক্ষ কোটি টাকা এবং ক্যাপেক্স ইনসেনটিভ হিসেবে ৭৬, ০০০ কোটি টাকা শিল্পপতিদের হাতে তুলে দিয়েছে সরকার, কিন্তু তাতে শিল্পের প্রসার হয়নি সামান্যতমও। পাশাপাশি ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইন (NMP)-এর মধ্য দিয়ে রেল, রোড, পোর্ট, ডক, টেলিকমিউনিকেশন-এর গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ জলের দরে শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পূর্বে বা পরে যে ৪১টি শ্রম আইনগুলি লাগু হয়েছিল, তা মালিক শ্রেণীর কোনো সদিচ্ছার জন্য হয়নি, শ্রমিকশ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবার জন্যই হয়েছিল। সরকারী কর্মচারী ক্ষেত্রে যে বিধি তৈরী হয়েছে তাতেও এই আইনগুলির প্রভাব রয়েছে। আজ এই শ্রম আইনগুলি আক্রান্ত হয়ে পড়লে সরকারী কর্মচারীদের সার্ভিস রুলগুলিও আক্রান্ত হয়ে পড়বে। যেসব আর্থিক ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সরকারী কর্মচারীদের জন্য স্বীকৃত আছে, তা রাজ্যের শাসকদল

● চতুর্থ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

Editor : MANAS KUMAR BARUA
SANGRAMI HATIAR
State Co-ordination Committee
53rd Year, 2nd Edition, June, 2025
Regd. No. : 18484/71

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

৯ জুলাই ধর্মঘট ঃ প্রেক্ষাপট ও করণীয়

অস্বীকার করতে সর্বদা সচেষ্ট। ইতিমধ্যে যদি শ্রমকোডগুলি লাগু হয়ে যায় তবে তার হাত ধরে সরকারী কর্মচারীদের সার্ভিস রুলগুলিরও ক্ষতিকারক পরিবর্তনের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ফলে AISGEF-এর ডাকে আমরাও শ্রমকোড বাতিলের আহ্বান জানাচ্ছি।

উপরে উল্লেখিত শ্রমজীবী মানুষদের উপর যে ভয়াবহ শোষণ ও অত্যাচার নামিয়ে আনা হয়েছে তার প্রেক্ষাপটে গত ১৮ মার্চ, ২০২৫ দিল্লির প্যারেলাল ভবনে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির জয়েন্ট প্লাটফর্মের ন্যাশনাল কনভেনশনে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয় যে ২০ মে, ২০২৫ সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট করা হবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই গত ২২ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের বৈসরণ উপত্যকায় সন্ত্রাসবাদী হামলায় ২৬ জন নিরীহ পর্যটকের মৃত্যু ও তাকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে সীমান্ত সংঘর্ষ শুরু হয়, সেই পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেই ২০ মে তারিখের ধর্মঘট স্থগিত রেখে তা ৯ জুলাই, ২০২৫ সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ধর্মঘটের মূল দাবিগুলির সঙ্গে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আর্থিক ও অন্যান্য বঞ্চনাগুলি যুক্ত করে এই ধর্মঘটে শামিল হয়েছে। ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে ২০০৯ সালের রোপা অনুযায়ী যে বকেয়া ডি.এ. রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্য তার ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দিতে হবে ৬ সপ্তাহের মধ্যে। বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে রোপা, ২০০৯-এ কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা পাওয়ার যে আইনসঙ্গত অধিকার দেওয়া হয়েছিল তার ভিত্তিতেই এই রায়দান করা হয়েছে। একই সঙ্গে রোপা ২০১৯ অনুযায়ী আমাদের বকেয়া মহার্ঘভাতার পরিমাণ এই মুহূর্তে ৩৭ শতাংশ। তাই বকেয়া মহার্ঘভাতার ২৫ শতাংশ এবং বর্তমান রোপা, ২০১৯-এর ৩৭ শতাংশ অবিলম্বে মঞ্জুর করতে হবে। এটি আমাদের ধর্মঘটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবি হয়ে উঠেছে। এছাড়াও শূন্য পদে স্বচ্ছভাবে নিয়োগের দাবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখতে পাচ্ছি সরকারী পদে বা বিদ্যালয়ে নিয়োগে কী দুর্নীতি হচ্ছে। তাই স্বচ্ছভাবে শূন্যপদ পূরণের দাবি ধর্মঘটের দাবি হয়ে উঠেছে। আবার প্রশাসনের অভ্যন্তরে একদিকে স্থায়ীপদে নিয়োগ যেমন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে, তেমন বিপুল সংখ্যক অস্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। এই অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ আমাদের ধর্মঘটের গুরুত্বপূর্ণ দাবি। সামগ্রিকভাবে রাজ্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিলোপ করার যে প্রচেষ্টা চলছে, আইনের শাসন ধ্বংস করে লুম্পেন পরিচালিত রাজ্যে পরিণত করার যে প্রক্রিয়া চলছে, তার অবসান ঘটাতে হবে অবিলম্বে। গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা এ রাজ্যের সমস্ত সমস্যার মূল আধার। তাই রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখা ও সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে রুখে দেওয়ার দাবি এই ধর্মঘটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবি হয়ে উঠেছে। এই সমস্ত দাবিগুলি নিয়ে আগামী ৯ জুলাই, ২০২৫ তারিখের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে আমাদের প্রচার প্রস্তুতি চলছে ব্যাপকভাবে। সমস্ত অফিসগুলিতে ধর্মঘটের সমর্থনে ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে আমাদের, কর্মচারীদের ধর্মঘট করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করার কাজে ৯ জুলাই-এর পূর্ববর্তী সময়কে ব্যবহার করতে হবে আমাদের। □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

৪ জুলাই দু ঘণ্টার কর্মবিরতি

সাক্ষী হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কেন্দ্রের এবং রাজ্যের দুই শাসকদলের লক্ষ্য হলো সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কষ্টের জীবনযাপনকে আরও চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতিতে কীভাবে শাসকদলের মন্ত্রী থেকে নেতারা জড়িয়ে আছে, কীভাবে দিন দিন সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও দুর্বল করে দিয়ে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে, তিনি তাঁর

আলিপুরদুয়ার

পূর্ব বর্ধমান

বক্তব্যে তুলে ধরেন। শিক্ষক, কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে দপ্তর থেকে রাজপথে নেমে লাগাতার লড়াই আন্দোলনের প্রয়োজন। তিনি বলেন প্রয়োজনে শুধু একদিন নয়, লাগাতার ধর্মঘটের রাস্তায় যেতে হবে।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশিষ্ট আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন যে বর্তমান রাজ্য সরকার বিভিন্ন ক্লাব, মদতপুষ্ট সংগঠনগুলিকে টাকা দিয়ে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করায়, কিন্তু কর্মচারীদের ন্যায্য প্রাপ্য দেয় না। সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পরেও মুখ্যমন্ত্রী চেষ্টা করে চলেছেন যাতে মহার্ঘভাতা দিতে না হয়। নানা বাহানা তৈরী করা হচ্ছে। কর্মচারী, শিক্ষক এবং অবসরপ্রাপ্তদের মধ্যে বিভাজনের চেষ্টা করা হচ্ছে। বঞ্চিত করা হচ্ছে ন্যায্য অধিকার থেকে, যে অধিকার দিয়ে গিয়েছেন বিগত বামফ্রন্ট সরকার।

বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন, এই সমাবেশ দাবি তুলছে যে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রকাশ্যে আনতে হবে, আদালতের নির্দেশ মেনে বকেয়া ডিএ প্রদান করতে হবে নির্দিষ্ট সময়ে। আদালতের পাশাপাশি আমাদের রাস্তায় নেমে লড়াইকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলতে হবে। সরকার দাবি করছে যে উন্নয়ন করার জন্য নাকি মহার্ঘভাতা প্রদান করা যাচ্ছে না। কিন্তু এই সরকারের উন্নয়ন আসলে দুর্নীতির, কাটমানির উন্নয়ন। রাজ্য সরকার আসলে চাইছে শিক্ষক, কর্মচারীদের সাথে সাধারণ মানুষের বিরোধ তৈরী করতে। সে চেষ্টা সফল হবে না। আদালতের নির্দেশ মেনে যদি বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রকাশ করা না হয়, বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান করা না হয়

শিলিগুড়ি

খাদ্যভবন, কলকাতা

তবে আগামী ৪ জুলাই সারা রাজ্যের প্রতিটি দপ্তরে ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করা হবে, অচল করে দেওয়া হবে রাজ্য প্রশাসন। এদিনের বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে আগামী ৯ জুলাই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট সর্বাত্মক সফল করার শপথ নেওয়া হয়। □

দীপঙ্কর বাগচী

পুরুলিয়া

আমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনা
বহু প্রশ্নের মুখে বোয়িং টাটার 'ড্রিমলাইনার'

আমেদাবাদ বিমানবন্দরের রানওয়ে ছেড়ে ওড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিমানবন্দর থেকে মাত্র ১২ কিলোমিটার দূরে মেঘানিনগরে এক মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলের ছাদ ঘেঁষে ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডনগামী বোয়িং ৭৮৭-৮। সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দে দাউদাউ আগুনে জ্বলে যায় চারপাশ। ১২ জুন দুপুর পৌনে দু'টো নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। সেই সময় বিমানটি মাটি থেকে মাত্র ৮২৫ ফুট ওপরে ছিল। বিমানে ২৩০ জন যাত্রী এবং ১২ জন বিমানকর্মী ছিলেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক ব্রিটিশ নাগরিক বাদে সকলেরই মৃত্যু হয়। বিমানে ছিলেন গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রুপানি। শুধু বিমান যাত্রী নয়, যে হস্টেলের ওপর বিমানটি ভেঙে পড়ে, সেখানকার দশজন আবাসিকেরও মৃত্যু হয় এবং অনেকে জখম হন। সেই সময় হস্টেলের ডাইনিং হলে অনেকেই খাচ্ছিলেন। আকাশ থেকে মাটিতে পড়তেই বিমানটিতে বিধ্বংসী আগুন ধরে যায়। সেই আগুন ছড়িয়ে গিয়ে একাধিক বহুতল ও প্রচুর গাছগাছালি পুড়ে যায়। বহু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা অনেক গাড়িতে আগুন লেগে যায়। প্রবল ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষ। বিমানের যাত্রীদের মধ্যে ১৬৯ জন ভারতীয়, ৫৩ জন ব্রিটিশ, ৭ জন পোর্তুগালের নাগরিক এবং ১ জন কানাডার নাগরিক ছিলেন। আমেদাবাদের সরকারি হাসপাতালে মোট ২৬৫ জনের দেহ নিয়ে যাওয়া হয়।

আমেদাবাদ থেকে লন্ডনের দূরত্ব প্রায় সাত হাজার কিলোমিটার। আকাশপথে ছ'ঘণ্টা মতো সময় লাগার কথা। এই দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়ার আগে বিমানের সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হয়েছে কিনা সেই প্রশ্ন জোরালো আকার নিয়েছে। এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এ এ আই বি) এই দুর্ঘটনার তদন্ত করবে। রানওয়ে থেকে ওড়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মাটিতে ধপ করে নেমে এসেছিল টাটার এই 'ড্রিমলাইনার' বিমানটি। তারপরেও সতর্ক হয়নি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। প্রশ্ন উঠেছে, রানওয়েতেই ছোটখাটো বিপদের মধ্যে পড়ার পরও কেন বিমানটিকে উড়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলো? কেন খতিয়ে দেখা হলো না নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও ত্রুটি আছে কিনা। এর আগেও 'ড্রিমলাইনার' বিমান বহুবার দুর্ঘটনার মুখে পড়েছে। তাই ফের আলোচনায় চলে এসেছে আমেরিকার বোয়িং কোম্পানির তৈরী ওই মডেলের বিমানের প্রযুক্তিগত ত্রুটির বিষয়। জানা যাচ্ছে, সস্তার পরিত্যক্ত যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরী হয়েছে বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার। একেকটি বিমানে অন্তত ৫৩টি এমন যন্ত্রাংশ রয়েছে, যেগুলোর গুণমান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। তড়িঘড়ি অর্ডার সাপ্লাইয়ের চক্করে বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় বিমানটি তৈরী করা হয়নি। ইঞ্জিন কিংবা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশের সঠিক প্রক্রিয়া মেনে মেরামতি কিংবা রক্ষণাবেক্ষণের তেমন সুযোগ এই বিমানে নেই। বিমানের ইমারজেন্সি সিস্টেম ঠিকভাবে কাজ করে না। আপদকালীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে চারবারের মধ্যে অন্তত একবার মুখ থুবড়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে এই বিমানের। খোদ বোয়িং কোম্পানির পরীক্ষা নিরীক্ষাতেই এই মডেলের বিমান বহুবার পাশ করতে পারেনি। এই বিষয়ে আমেরিকার সাউথ ক্যারোলিনার বোয়িং কারখানার শ্রমিক জন বার্নেট মুখ খোলায় ২০২৪-এর মার্চে তাঁর রহস্যজনক মৃত্যু হয়। তাঁরই মতো নাছোড়বান্দা আরেক শ্রমিক রিচার্ড কুয়েভাস গত বছর সংবাদমাধ্যমকে জানান, বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার বিমানটির আগাগোড়া নকশাতেই নাকি ত্রুটি আছে। নিরাপত্তার কোনও নিয়মবিধি মেনে এই বিমান তৈরী হয়নি। তাই উড়ানের সময় তা বেশ বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। এই বিষয়টি বোয়িং কোম্পানির কর্তৃপক্ষকে জানালে তারা অভিযোগটি উড়িয়ে দেয় এবং এই নিয়ে জানাজানি হলে কুয়েভাসকে রীতিমতো প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়। ২০১১ সালে প্রথম বারের জন্য ৭৮৭ ড্রিমলাইনার বিমানটি এয়ার ইন্ডিয়ার জন্য আমদানি করা হয়। সেই সময় সংস্থাটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ছিল। ২০১৭ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত এই বিমানের যাত্রী নিরাপত্তা সংক্রান্ত ত্রুটি নিয়ে দুনিয়া জুড়ে একাধিক অভিযোগ ও বিতর্ক ওঠে। মামলা দায়ের করা হয় বিভিন্ন দেশের আদালতে। একাধিক দেশে এই বিমান নিষিদ্ধও করা হয়। এরই মধ্যে ২০২২-এ এয়ার ইন্ডিয়ার মালিকানা টাটার হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, পুরোপুরি মুনাফার স্বার্থের কথা ভেবে টাটা কর্তৃপক্ষ শুধুই যাত্রী পরিষেবার কথা ভেবেছে, কিন্তু যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে ভাবেনি। ঝাঁ চকচকে আসবাব কিংবা খাবারের গুণগত মান উন্নতি করেই তারা ভেবেছিল এয়ার ইন্ডিয়ার 'বদনাম' তারা মুছে ফেলতে পারবে। কিন্তু সমস্যাটা অনেক গভীরে। এয়ার ইন্ডিয়ার বেশির ভাগ বিমানে ব্যবহৃত ইঞ্জিন সঠিকভাবে মেরামতি বা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। সময়মতো নিরাপত্তা সমীক্ষাতেও ঘাটতি আছে। তাছাড়া রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারীদের বিভিন্ন ঠিকাদার মারফত নিয়োগ করা হয়। তাদের দক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। □

ইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী

সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
সহযোগী সম্পাদক ঃ সুমন কান্তি নাগ
যোগাযোগ ঃ
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।